র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে--জল পড়ে, পাতা নড়ে।
তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নিচে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে--কালো জল, লাল ফুল।
বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য নূতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।
বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে--লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।
এ প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনোপ্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।
উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শুনিলে তাহার আত্মীয়স্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে ; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।
শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে, সেগুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।
উমা একদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল-- গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।
গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবিশিষ্ট পেনসিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।
শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অনুতপ্তচিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।
উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নিচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।
ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিস্ময়, কাহারও লোভ, কাহারও বা দ্বেষ হইত।
প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল--পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল। শয়নগৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।
দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল ; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান--ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দুটা-একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নিচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিংবা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই--যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা। কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু-পাতা অন্তরে পূর্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা দোষ লক্ষিত হয়। একস্থলে দেখা গেল-- হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পরবৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া ঘোমটায় ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা, শাশুড়ীর কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিসনে।"

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, "দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াসনে ; সে তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাসনে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিল, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ত্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেকদিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছুদিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন ; পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কিছুই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল--যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজকাল বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্বোদ্ধৃত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে--দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো

খারাপ করে দেব না।
শুনা যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়।
গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয় দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশ বিদ্রূপে জড়িত এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।
লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল--দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।
একদিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌতূহল হইল-- সে ভাবিল বউদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।
তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সে-ও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল।
তাহার ছোটো অনঙ্গমঞ্জরী, সে-ও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।
উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।
প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেলন টিকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।
তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সুক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয় ; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্‌দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।
প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল-- বলিল, “শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।”
উমা ভালো বুঝিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই এই জন্য তাহার এখনও ততদূর রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত সংকুচিত হইয়া গেল--মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।
বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।
উমা গান গাহিতে পারিত না ; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল--
“পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।

শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রানী ধায়,
কই উমা বলি কই।
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা, করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে--
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।

অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।"

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিসনে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই--আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।"

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কৃতকার্য না হইয়া অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল, "খাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক সুর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল ; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল ; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারিমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকন্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।